ভালোবাসার বাংলাদেশ

সম্পাদনা

আদনান ফারুক হিল্লোল

সূচি

ভূমিকা ॥ ০৯

সুদর্শন যুবকটির প্রেমে পড়ে গেলাম : সাবরিনা ॥ ১১

জীবনের স্বপ্নগুলো ভেঙে গেল : হুমায়ুন কবির সোহাগ ॥ ৩০

টাকা-স্বামী সব হারালাম : রোমানা ॥ ৫৩

বাবা-মা আমাকে ডাকছে : যাসনে, ফিরে আয় : শিমুল ॥ ৬২

চিঠিতে প্রেম শুরু— বিয়েতে জীবন শেষ : তানিয়া ॥ ৮৪

মা-বাবার পরিচয় জানি না : কণা ॥ ১০৫

হ্যাঁ মামা, তুই পারিস : হাসানুল হক রাতুল ॥ ১১৯

স্মৃতিময় জানালা : রুহি ॥ ১২৪

ভূমিকা

ঢাকা এফএম ৯০.৪ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এইচডি এফএম রেডিওস্টেশন। চালু হওয়ার পর থেকে দিন দিন ঢাকা এফএম শ্রোতাদের মন জয় করে আসছে বিভিন্ন ধরনের জননন্দিত অনুষ্ঠান দিয়ে। ঢাকা এফএম ৯০.৪-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামের একটি হচ্ছে 'ভালোবাসার বাংলাদেশ'। এখন পর্যন্ত বিভিন্নজন তাদের ভালোবাসার গল্পগুলো শেয়ার করেছেন আমাদের চ্যানেলে। অনুষ্ঠান চলাকালে এবং অনুষ্ঠানের পরে লাখ লাখ শ্রোতাই তাদের মতামত জানিয়েছেন, ভালোলাগা, কষ্ট লাগার কথা জানিয়েছেন। নিয়মিত বিভিন্ন শ্রোতা আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন আমরা যেন আমাদের সেরা গল্পগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশ করি। কারণ আমাদের অনুষ্ঠানে শেয়ার করা বাস্তব জীবনের গল্পগুলো বইয়ের গল্প-উপন্যাসকেও হার মানিয়েছে বলে অনেকেই অভিমত পাঠিয়েছেন। প্রেম-বিরহ, ঘৃণা-ভালোবাসা, পাওয়া না-পাওয়া, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যিকার গল্পগুলো আমাদের নাড়িয়ে দেয়, ভাবায়, সুখে হাসায় বা দুঃখে ভাসায়।

শ্রোতাদের ভালোবাসার দায় শোধ করার জন্য ভালোবাসার বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পগুলো নিয়ে বই নিয়ে এসেছি। বইটি এমনভাবে রচিত হয়েছে, যেখানে প্রতিটি গল্পে একজন পাঠক উপন্যাসের স্বাদ পাবেন। আমরা আলাপচারিতার ঢংয়ে নয়, বরং গল্পকথকের জবানিতে পুরো গল্পটা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। গল্পের ধারাবর্ণনায় যেন বাধা সৃষ্টি না করে এ জন্য গল্প চলাকালে আমাদের উপস্থাপকদের বিভিন্ন প্রশ্ন বা মন্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়নি। আমরা গল্পের ভেতরের গল্পও নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি।

প্রেমে যেমন ফুল আছে, তেমনি কাঁটাও আছে। ফুলের সুবাসে আমরা যেমন বিমোহিত হই, তেমনি কাঁটার আঘাতে রক্তাক্ত হই, ক্ষতবিক্ষত হই। আমাদের গল্পগুলো শুধু সফল প্রেমের গল্পই নয়, অনেক ব্যর্থতা, অনেক বোকামিরও গল্প। সফল প্রেমের গল্পগুলো যেমন আমাদের আনন্দিত করবে, তেমনি ব্যর্থতার গল্পগুলো আমাদের হৃদয়ে কাঁটা দেবে।

আমাদের কয়েকটি গল্প যেমন আশা জাগানিয়া, তেমনি কিছু গল্প সতর্কসংকেত। বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিটি গল্প পাঠকের ভালো লাগবে বলে আমি শতভাগ নিশ্চিত। প্রথমবারের মতো বইমেলায় ভালোবাসার বাংলাদেশ প্রোগ্রামের জননন্দিত গল্পগুলো নিয়ে বই নিয়ে আসতে পারায় আমরা খুবই আনন্দিত। যারা এই গল্পগুলো আগে শুনেছেন তারা এখন পড়েও মজা পাবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর যারা শোনেননি তারা বইটি পড়েই পুরো স্বাদ নিতে পারবেন নিঃসন্দেহে।

আদনান ফারুক হিল্লোল

সুদর্শন যুবকটির প্রেমে পড়ে গেলাম

সাবরিনা

আমার গ্রামের বাড়ি নিলফামারীতে। ওখান থেকে আমি এইচএসসি শেষ করেছি। তারপর ঢাকায় চলে আসা। ঢাকায় এসে অনার্স, মাস্টার্স করি। নিলফামারী খুব সুন্দর একটা জায়গা। সত্যি কথা যেটা, আমি কিন্তু স্কুললাইফে অত সুন্দর ছিলাম না। সুন্দরীদের লিস্টে ৫, ৬, ৭, ৮— এরকম সিরিয়ালে ছিলাম। আমাদের স্কুলে যেটা হতো, প্রতিবছর একটা লিস্ট বের হতো। আমাদের এলাকার ছেলেরা টপটেন লিস্ট বানাত। খুব মন খারাপ হতো, কখনো পাঁচের মধ্যে যেতাম না। ২, ৩, ৪-এ তো স্বপ্নেও আসতে পারিনি।

যেভাবে লিস্ট করা হতো, সেটা হচ্ছে খুব সকালবেলা ছেলেরা এসে গেটের সামনে লিস্ট লাগিয়ে দিয়ে যেত। আমরা ওই দিন স্কুলে এসে দেখতাম গেটের সামনে সুন্দরীদের লিস্ট। আমরা তো গার্লস স্কুলে পড়তাম। আমাদের আশপাশে বয়েজ স্কুলের ছেলেরা এটা করত। ছেলেরা গোপনে পিয়নকে টাকা দিয়ে, আর্লি মর্নিংয়ে এসে ওটা লাগিয়ে দিত। প্রতিবছর এটা করা হতো। ওপরে লেখা থাকত 'নিলফামারী টপটেন গার্লস'।

মফস্বল শহর। সে জন্য খুব ছোট একটা জায়গা। তো, ওই জায়গায় আমাদের সবাই চিনত। যে এ অমুকের মেয়ে, যার জন্য অনেকের সাহস হতো না। আমার বাবা, চাচাকে সবাই জানত ভালো। তো, কেউ সাহস করতে পারত না। এটাও আমার একটা কষ্ট ছিল। আমাকে কেউ ভয়ে কিছু বলতে আসতে পারত না। তবে একটা দিক দিয়ে ভালো ছিল এটা, হয়তো এটার কারণে প্রেম-ট্রেম করা হয়ে ওঠেনি ছোটবেলায়। চিঠি পেতাম। একটা ফানি চিঠি, যে চিঠি পাঠিয়েছে, সে নিলফামারীর স্থায়ী ছিল না। তার বাবা সম্ভবত ওখানকার এসপি ছিলেন। যেহেতু জানত না আমি কার মেয়ে বা কার ভাতিজি। সেই ছেলে যে চিঠি পাঠিয়েছে, সেটা ছিল দরখাস্ত।

আমরা টিচারদের যেরকম দরখাস্ত করি, সেরকম দরখাস্ত। যেমন—

বরাবর

ওমুক ওমুক।

বিষয় : ভালোবাসা চাহিবার আবেদন জানিয়ে...

বিস্তারিত...

আপনাকে ভালো লাগে। হেন্ তেন্..... ।

মজার ব্যাপার হলো, বাসার অ্যাড্রেসে চিঠিটা আসেনি। স্কুল থেকে আমার বাসা খুব কাছে, হাঁটা-দূরত্ব। হেঁটে আসছিলাম, তখন ছেলেটি বাইক দিয়ে যাচ্ছিল। চিঠিটা ছুড়ে ফেলে পাশ দিয়ে চলে গেল। খুব আগ্রহ নিয়ে রাস্তা থেকে চিঠিটা কুড়িয়ে নিলাম। এবার বাসায় এসে চিঠি পড়ব; কিন্তু জায়গা পাচ্ছি না কোথাও। বাসায় কিন্তু কেউ নাই, তার পরও এত ভয়। মানে চিঠিটা খুলব, কোথায় গিয়ে খুলব। ভয় পেতাম, কখন বাসায় ধরা পড়ব, তারপর বিশাল পানিশমেন্ট।

তখন তো ল্যান্ড লাইন ছিল। অনেক ফোন আসত। আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল, নাম বুবলি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ও এখন কানাডায়। বুবলি ছিল অনেক লম্বা। প্রায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। ওর চেহারার সাথে বলিউডের নায়িকা সোনালি বেন্দ্রের চেহারার মিল ছিল। তো, ছেলেরা সবাই সোনালি বেন্দ্রে বলে ডাকত। আমার বাসা স্কুলের খুব কাছে ছিল বলে প্রায় সময় দেখা যেত ওরা আমাদের বাসায় যেত। বিশেষ করে স্কুলে যাওয়ার পথে আমার বাসায় উঠত এবং আমাকে নিয়েই স্কুলে রওনা হতো।

তো, বুবলি আমাদের বাসায় এলে, ছেলেরা বাইক নিয়ে ঘোরাঘুরি করত। বুবলি আমার বাসায় আসছে, সোনালি বেন্দ্রে যাচ্ছে— এমন এমন কথা। ওরাও ফলো করে করে আসত। বাসায় যখন ঢুকত, তখন ছেলেরা ফোন দিত। বুবলি আসলেই খুব সুন্দরী ছিল। অনেক সময় আব্বু ফোনে থাকত। আব্বু থাকলে ফোনে কথা বলত না ওই ছেলেরা। আব্বু আবার বকা দিত, 'কী, কথা বলো না কেন?'

একদিন এক ছেলে আব্বুর কাছে ফোন করে জানতে চাইল, 'এখানে কি সোনালি আছে?' আব্বু জবাব দেয়, 'এখানে সোনালিও নেই, রুপালিও নেই।' আমরা যদি ফোন ধরতাম তাহলে কথোপকথনটা এরকম ছিল— 'হ্যালো, একটু ওকে দাও না! একটু কথা বলি।' আমরা জিজ্ঞেস করতাম, 'কী বলবেন, বলেন?' বুবলি খুব ম্যাচিউরড ছিল, আমরা সে তুলনায় কম ম্যাচিউরড ছিলাম।

আমরা ফান, খেলাধুলার মধ্যে ছিলাম। ছোটবেলায় ওর মধ্যে একটা বড় বড় ভাব ছিল। বয়সের তুলনায় সে অনেক বুঝত। তাই ছেলেরা ফোন দিলে ওকে ধরিয়ে দিতাম। বুবলি বেশির ভাগ ছেলেকেই একটা কমন ডায়লগ দিত। সেটা হলো— 'আমার বাসায় প্রপোজাল পাঠান।'

আমি ছোটবেলা থেকেই ফাঁকিবাজ। আমি কখনোই কোনো ক্যারিয়ার করব— এমন কিছু ভাবি নাই। ছোটবেলায় যখন যেটা দেখতাম, তখন সেটাই হবো ভাবতাম। তখন আমি অনেক খেলাধুলা করতাম। এ জন্য আমার মনে হতো যে আমি খেলোয়াড় হব। সাফ গেমসে খেলব, অলিম্পিকে খেলব— এরকম বিভিন্ন স্বপ্ন দেখতাম। খেলাধুলা করে অনেক নাম করব— এমন ভাবতাম। তখন আসলেই খেলাটাকে অনেক ভালোবাসতাম। আস্তে আস্তে যখন বড় হচ্ছিলাম, তখন যেটা ভালো লাগত, সেটা হতেই ইচ্ছা করত। আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে আসলাম, তখন আমার মনে হতো আমি মিডিয়াতে কাজ করব।

আপনার প্রেমিক বা জামাই কেমন হবে— সেটা নিয়ে তেমন ভাবনাও ছিল না, স্বপ্নও ছিল না। হাজব্যান্ড কে হবে, কেমন হবে? আমি দেখতাম আমার ফ্রেন্ডরা যখন একটু বড় হচ্ছে, তাদের ভেতরে অনেক পরিবর্তন আসা শুরু করেছে, তারা কেমন যেন একটু শান্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা যেন তাদের ছোটবেলা থেকে বের হয়ে আসছে। আমি কিন্তু তখনো তাদের মতো হতে পারিনি। তখনো মনে হচ্ছিল আমি ওদের থেকে পিছিয়ে। এগুলো আমি অনেক পরে এসে বুঝতে পেরেছি। অনেক আগেই ওরা ম্যাচিউরড হয়ে গেছে। আমার লাইফটাই ছিল খেলাধুলা, ফান আর আনন্দে ভরা। বৃষ্টির দিনে যখন বাইরে যেতে পারতাম না, তখন ঘরে বসে বসে পুতুল খেলতাম।

আমার নিজের কারণে বাড়িতে মার খেতে হয়েছে বা বকা খেতে হয়েছে এমনটা খুব কমই হয়েছে। তবে ফ্রেন্ডের কারণে বকা খেতে হয়েছে। আমার এক ফ্রেন্ড আরেক ফ্রেন্ডকে ডেটে নিয়ে যাওয়াতে সাহায্য করেছে। সেটা যেভাবেই হোক দুই ফ্রেন্ডের বাসায় জানাজানি হয়ে যায়। তখন আমাকে একজন ওটার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল যে এটা ও ছিল না। আমি যেন বলি আমি ছিলাম সেখানে। আমি সেটা না করলে তার বাসায় খুব খবর করে দেবে। আমি তো আগামাথা কিছু বুঝি নাই, আমি তার বাড়ির সামনে গিয়ে বললাম, আন্টি, ওই দিন তো আমি ছিলাম, ও ছিল না। পরে কাহিনিটা জেনেছি। তার মানে আন্টির কাছে খারাপ আমি হলাম। ফ্রেন্ডকে বাঁচাতে গিয়ে এটা হয়েছিল। পরে ফ্রেন্ডের বাবা-মা আমার আব্বু-আম্মুকে জানিয়েছেন। তখন ডিসিশন নেওয়া হলো আমার পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হবে; আমি বাসায় কাজ করব।

কলেজ খুব অল্প সময়ের জন্য, দুই বছর। কলেজে অনেক প্রেশার ছিল। দুই বছরে অনেক ভালো রেজাল্ট করে, কোনোরকমে ওখান থেকে বের হয়ে বাবা-মার কাছ থেকে দূরে যাব। বাসায় এত বেশি শাসন ছিল, মনে হচ্ছিল কবে একা থাকব নিজের মতো করে। তখন পুরো টাইমটাই পড়াশোনা নিয়ে অনেক ব্যস্ত ছিলাম। কারণ, এসএসসিতে যে রেজাল্ট এক্সপেক্ট করেছিলাম, তার চেয়ে একটু কমই ছিল। তো টার্গেট ছিল যে কলেজে এটা ব্যালেন্স করে নিতে হবে। কলেজে ভালো রেজাল্ট করেই বের হতে হবে। তো পড়াশোনা, প্রাইভেট, কলেজের মধ্যেই ছিলাম ওই দুই বছর। কলেজ থেকে বের হয়ে চলে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় এসে ভর্তি, কোচিং, প্রাইভেট নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল।

শৈশবের শহর নিলফামারীকে ছেড়ে আসাতে প্রথম প্রথম ততটা খারাপ লাগত না আসলে। তার কারণ ছিল, যাদের মিস করব বেশি, তারা সবাই তো একসাথে ঢাকা চলে এসেছিলাম। এটা ঠিক যে বাবা-মাকে অনেক মিস করতাম, মাঝে মাঝে বাসায় যাওয়ার জন্য অনেক কান্নাকাটিও করতাম। কিন্তু ঢাকায় মোটামুটি ভালোই লাগত। আমি তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম। আব্বু বাসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা বান্ধবীরা কয়েকজন মিলে থাকতাম। ওখান থেকেই কোচিংয়ে যাওয়া-আসা করতাম।

কোচিং সেন্টারে এসে প্রথম সহশিক্ষা মানে একসাথে ছেলেমেয়ে পড়ার সাথে পরিচয়। কোচিংয়ে আমার ব্যাচমেট বা কাছাকাছি সবাইকে ছোট ছোট লাগত। ক্লাসের ছেলেদের সাথে সম্পর্ক বাধানোর জন্য কোনো আগ্রহই ছিল না। দেখা যেত যে সে সময়টাতে পড়াশোনা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতাম। আমি যেখানে কোচিং করতাম, সেখানে কিছু সিরিয়াস গ্রুপ ছিল। আমরা ছিলাম সেই সিরিয়াস গ্রুপের মধ্যে। ওখানে বেশির ভাগ স্টুডেন্টই ছিল ক্যাডেট কলেজের। ওরাও মনে হয় অনেক দিন পরাধীনতার মধ্যে ছিল। সব পরাধীন লোকজন আমরা একসাথে ওখানে। তো, সবাই কম-বেশি দুষ্টামি করতাম। ওরা খুব ফানি ফানি কথা বলত। মাঝে মাঝে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। একদিন একটা ড্রেস পরেছিলাম, ড্রেসটাতে নেটের মতো করে সুতা দিয়ে ব্যাক সাইডে কাজ করা ছিল। পেছনে বসা এক স্টুডেন্ট মন্তব্য করেছিল 'দেখো, মেয়েরা কত ডিজাইনের জামা পরে। তার ওপরে আবার ভেন্টিলেটরও রাখে।' এরকম আরও অনেক কথা হতো।

যখন ক্যান্টেনমেন্টে ছিলাম, তখন এক ফ্রেন্ডের বার্থ ডে পড়ে। সেটা ছিল ১৬ অক্টোবর। সেই ফ্রেন্ড আমাদের তার বার্থ ডে-তে ট্রিট দেবে (খাওয়াবে) বলে কথা দেয়। ওই সার্কেলে আমরা ছিলাম সাত-আট জন। আর আমাদের সাথে কিছু ছেলে ফ্রেন্ড ছিল নিলফামারীর। ওরা আলাদা জায়গায় থাকত কিন্তু বিভিন্ন

সময়ে আমাদের হেল্প করত, আমাদের এখানে আসত। সেদিন যেহেতু আমাদের ওই ফ্রেন্ডের বার্থ ডে ছিল, তাই ওরা দুই-তিনজন ছেলে এসেছিল। আমরা বাকি সাত-আটজন ছিলাম মেয়ে।

সবাই মিলে আমরা ক্যান্টনমেন্টে গ্যারিসন নামে সিনেমা হলটির পাশে একটা কফি হাউসে গেলাম। সবাই মিলে আগেই প্ল্যান করেছিলাম, আমরা সেখানে যাব এবং খাওয়া-দাওয়া করব। কোচিং থেকে আমরা দলবেঁধে সেখানে গেলাম। ও যেহেতু ট্রিট দেবে, এ জন্য সেদিন সবাই উপস্থিত হয়েছিল। কফি হাউসের সামনে যাওয়ার পর দেখলাম হঠাৎ করে একটা রেড কালারের স্পোর্টস বাইকে চড়ে এক সুদর্শন যুবক নামল। আসলেই বাইকটা ছিল অনেক সুন্দর। বাইক থেকে যে নামল, তার গায়ে ছিল রেড কালারের টি-শার্ট এবং ব্লু কালারের জিনস।

সেখানে অনেকগুলো দোকান ছিল। তার মধ্যে একটি ওষুধের দোকানে মনে হয় সে গিয়েছিল। প্রথমবারের মতো আমি এরকম ড্যাশিং একটা মানুষ দেখেছিলাম। প্রায় ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা এক সুদর্শন যুবক স্পোর্টস বাইক থেকে নামছে। ব্যাপারটা আসলেই চোখে লাগার মতো ছিল। তখন একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে ছিলাম আর কি। তো, আমাদের মধ্যে একটা ছেলে ফ্রেন্ড ছিল যার নাম রনি। সে হঠাৎ করে বলল— 'কিরে, কী হইছে?' তখন বললাম— 'না, কিছু না।' রনি নাকি দেখেছিল আমি ওই যুবকটির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। রনি জিজ্ঞেস করল ফোন নম্বর লাগবে নাকি? নিয়ে আসব? আমি বললাম— 'পাগল নাকি!' ও তখন বাজি ধরে বলে, যদি নিয়ে আসতে পারি কী খাওয়াবি? আমি বললাম কিছু খাওয়াব না। সে তখন আমার কাছ থেকে দৌড় দিয়ে বলে, 'দাঁড়া, নিয়ে আসি।'

রনি চলে গেল। দেখলাম অনেকক্ষণ ওই যুবকটির সাথে কী যেন কথা বলল। কথা বলে ফিরে এসে বলে— 'নে, ফোন নম্বর।' আমি বললাম— ফোন নম্বর নেব না। মনে তো ইচ্ছা ছিলই কিন্তু ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নিতে ইচ্ছা করে নাই। আবার মনে হচ্ছিল মেয়ে হিসেবে এগুলো ঠিক না। ফোন নম্বর আর সাথে ওই যুবকের নাম একটা ছোট কাগজে লিখে আমাদের কোচিংয়ের একটা বইয়ের ভেতরে দিয়ে দিল। সেটা আমি জানতাম না। দুই-তিন দিন পর ওই বই খুলে নম্বরটি দেখতে পেলাম। তখনো ভাবছিলাম ফোন করব কি করব না— এমন।

পরে রনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর সাথে কী কথা হয়েছিল। রনি জিজ্ঞেস করেছিল ও কী করে। তার জবাবে জানিয়েছিল সে আর্মিতে আছে। তখন রনি তাকে বলে, আমার এক ফ্রেন্ড আর্মিতে পরীক্ষা দিতে চায়, তো, প্রসিডিউরটা কিরকম, যদি বলেন। তখন বলেছে, 'এখন তো শর্ট টাইম, সেটা বলা যাবে

না। তুমি আমার ফোন নম্বরটা রাখো, পরে ফোন করো।' এভাবে রনি ফোন নম্বরটা সংগ্রহ করে এবং আমার বইয়ের ভেতরে রেখে দেয়।

ভাবতাম ফোন করব না। মেয়ে মানুষ ফোন করলে কেমন দেখায়! এটা তো একটা ছ্যাবলামো হবে, হ্যাংলামো হবে। এটা করাই যাবে না। তাহলে মানুষ খারাপ ভাববে। মাথার মধ্যে শুধু আসত এত লম্বা একটা ছেলে, এত স্মার্ট, তার ওপরে তার এত সুন্দর একটা বাইক আছে, স্পোর্টস বাইক। তখন বয়স অল্প ছিল, ওই জিনিসগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরত। এরকম সাত দিন যাওয়ার পরে মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে ফোন করি। তো, ফোন করলাম, অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, আমি ফোন করে কথা বলি নাই। তার ভয়েজ শুনে ভয়ে রেখে দিয়েছি। আবার ফোন করেছি, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি অমুক। সে বলল, হ্যাঁ। সে দেখি একেবারেই আমাকে চিনে গেল। আমি অবাক হলাম! 'আপনি আমার নাম জানেন কী করে?' তখন সে বলল যে তোমার ফ্রেন্ড বলেছে।

আমার ফ্রেন্ড এ পাগলামিটা করেছে। আমাকে এসে এরকম একটা ভদ্র গল্প শুনিয়েছে, যে আমি বলেছি আমার একটা ফ্রেন্ড আর্মিতে পরীক্ষা দিতে চায়, এ ব্যাপারে জানতে চাই। আর ওকে নাকি গিয়ে বলেছিল, 'আমার একটা ফ্রেন্ড আপনাকে অনেক পছন্দ করেছে।' সেটা আমরা অনেক পরে জানতে পারি।

আমরা ফোনে একটু একটু কথা শুরু করলাম। তার সাথে কথা বলার একটা টাইম ছিল। সেই টাইমেই তাকে পাওয়া যেত। ওই টাইমে কথা বলতে হতো। আফিস থেকে ফিরে বিকেলবেলা গেমসে যেতে হতো। এর মাঝখানে একটা ব্রেক ছিল। তার সেই ব্রেকটাতেই আমরা ৪৫ মিনিটের মতো কথা বলতাম। অনেক সময় হতো কি ফোন কানে রয়েছে অথচ কোনো কথা হচ্ছে না। আমরা পাঁচ-সাত মিনিট কোনো কথাবার্তা নাই। আবার কথা শুরু হলে নরমাল কথাবার্তা চলত। এই যেমন কেমন আছেন, কী করছেন, আজকে কি করলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমি খুব সিরিয়াস হয়ে যেতাম। আচ্ছা আমি কেন ফোন করছি, কেন কথা বলছি? এরকমও মনে হতো।

সে আমাকে একদিন জানাল আমরা রেস্টুরেন্টে ঢোকার পরে সে নাকি আরেকবার ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের দেখেছিল। আমরা তখন সেটা খেয়াল করিনি। অনেক পরে তার মুখ থেকেই সেটা জানতে পেরেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম ফোন নম্বর দিয়েই চলে গেছে, এই যা। কিন্তু সে আবার ব্যাক করেছিল এবং ব্যাক করে আমাদের দেখে গিয়েছিল। যেহেতু আমরা অনেকেই একসাথে ছিলাম এ জন্য আমাদের আলাদা করে চেনার উপায় ছিল না। সে শুধু আমার নাম জানত। রনি অতটুকুই দিয়েছিল।

আমাদের মধ্যে শুধু ফোনে কথা হতো। কখনো দেখা হয়নি। আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল ২৮ অক্টোবর। আর কথা শুরুর ১২ দিন পরই আমাদের দেখা হয়। একদিন কথা বলছিলাম, হঠাৎ করে বলল— আসবা, সামনে আসো, বাসা তো কাছাকাছিই। তার পোস্টিং ছিল ঢাকাতেই। আমি থাকতাম কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের পাশে। আমি বললাম ঠিক আছে, আসব। দুই-তিন ঘণ্টা আগে জানিয়েছিল। তখন আসলে আমি আবার সাজুগুজু করতে পারতাম না। ফাস্ট টাইম কারও সাথে দেখা করতে যাব। সে যে স্পেশাল কেউ এটা মাথার মধ্যে কাজ করত। ফ্রেন্ডদের বললাম, আমি কী করব। আমরা সাত বান্ধবী ছিলাম। সাতজনই আমায় সাজুগুজু করাল। মানে বিকাল থেকেই আমি কোন ড্রেসটা পরব, সেটা ঠিক করে দিতে থাকল। আমি তখন কাজল দিতে পারতাম না। আমার এক ফ্রেন্ড সুন্দর কাজল দিতে পারত। সে আমাকে কাজল দিয়ে দিল। একজন দিয়ে দিল লিপস্টিক।

আমি প্রথমবারের মতো ডেটিংয়ে যাচ্ছি। মনে অন্য রকম এক অনুভূতি কাজ করছিল। আমরা ওখান থেকে সামনে হেঁটে যাচ্ছি, সাথে ছিল আমার ফ্রেন্ডরা। আমার আবার একটু ভয়ও করছিল। কি না কি হয়ে যায়, বাসায় যদি কারও কানে চলে যায়! তোমাকে বিশ্বাস করে পড়াশোনা করতে এতদূরে পাঠিয়েছি আর তুমি এগুলো করে বেড়াচ্ছ? মনের মধ্যে যখন এমন ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখনই সেই বাইকটি চলে এল এবং বাইকে যথারীতি সেই সুদর্শন যুবক। আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। আমিও একটু ভয় পেয়ে তাদের অনুরোধ করছিলাম 'এই, তোরা যাচ্ছিস কেন, এদিকে আয়।' ওরা আর আসে না। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না সামনে যাব, না পেছনে যাব।

এরকম দোটানার মধ্যে অনেকক্ষণ ছিলাম। পরে দেখি সেই বাইকওয়ালা সুদর্শন যুবকটি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কাছে এসে বাইকে উঠতে বলল। আমি বললাম— 'না, বাইকে উঠব না। আমি আপনাকে চিনি না, আপনি যদি ছেলে ধরা হন?' তখন সে ফান করে বলল, 'ছেলে ধরা কেন হব, হলে তো মেয়ে ধরাই হব!'

ওখান থেকে কুর্মিটোলা গার্লস ক্লাব ওয়াকিং ডিসটেন্স (হাঁটার দূরত্ব) ছিল। আমরা ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। তখন সময়টা ছিল বিকাল পাঁচটার মতো। অনেক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে, কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্ধ্যা নামল। জাহাঙ্গীর গেটের সামনে 'বুক ওয়ার্ম' বলে একটা বইয়ের দোকান আছে। ওটার পাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আমাকে বলল— 'চলো, ওখানে গিয়ে বসি।' ওখানে যেতে হলে তো বাইকে উঠে যেতে হবে এবং সেটা অনেক দূর! আমার

বাইকে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না। যে বাইকটা আমার এত ভালো লেগেছে সে বাইকটাতে বসার সাহস হচ্ছিল না। অনেক কষ্টে বসছি; কিন্তু বাইকে তো আবার না ধরলে পড়ে যাব। ধরতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এ জন্য একটু গ্যাপ রেখে বসেছি। তখন সে খুনসুটি করে বলল— 'এই ভদ্রলোকের গায়ে এমন কোনো বড় অসুখ নেই যে তাকে ছোঁয়া যাবে না। অন্তত নিজের সেফটির জন্য হলেও ধরো বা পেছনে ধরো যাতে পড়ে না যাও। অবশেষে আমরা সেখানে গেলাম, বসে অনেকক্ষণ সময় কাটালাম, গল্প করলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম।

সেখানে কথার শুরুতে জিজ্ঞাসা করছিল, কেন তাকে ফোন করেছিলাম, নম্বর চেয়েছিলাম ইত্যাদি। আমি বললাম, আমি তো নম্বর চাইনি। এটা নিয়েই আমাদের মধ্যে হালকা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলছিল। সে ভাবত আমি অস্বীকার করছি। সত্য হলো যে আসলেই আমি নম্বর চাইনি। আমাদের বন্ধু রনিটাই, আগ বাড়িয়ে সবকিছু করেছে। আমি সেটাই বারবার বলছিলাম, নম্বর চাইনি। আমি জাস্ট দেখেছিলাম, ভালো লাগছিল। একটা মানুষ দেখতে এত সুদর্শন, স্মার্ট অতটুকুই। এখন রনি যদি আমার নাম ভাঙিয়ে নম্বর আনে, তাহলে আমি কী করব। বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ফোন কেন করেছিলে?'

আমরা একে অন্যকে পছন্দ করি বা ভালোবাসি এটা নিজে থেকে বলা হয়নি। আমি সেটা বলি নাই। সেও কখনো বলেনি। কিন্তু আমরা কথা বলতাম, একে অন্যকে ফিল করতাম। আমরা টানা পাঁচ বছর কথাই বলে গেছি, কেউ কখনো কাউকে কিছু বলিনি; বাট আমরা পছন্দ করতাম। আমরা প্রথমবারের মতো রেস্টুরেন্টে বসার পর বেশির ভাগ সময়ই একটু ভয়ে ছিলাম। মনে হতো এখুনই বুঝি আমাকে কেউ দেখে ফেলবে। আমার পরিচিতজনের কাছে বা আমার বাসায় খবর চলে যাবে। এই ভয়টা নিয়েই পুরো টাইম ছিলাম। তখন বেশি লাজুক ছিলাম। আমি লজ্জা পেলেই মুখে হাত দিতাম। আমরা যখন মুখোমুখি বসলাম পুরো সময়টাতেই ছিল আমার মুখে হাত। সে আমাকে মজা করে জিজ্ঞেস করে— 'তোমার মুখে কি কোনো সার্জারি বা অপারেশন হয়েছে?' আমি বলি— না তো! তাহলে সব সময় মুখে হাত দিয়ে কী ঢাকার চেষ্টা করছ? আমি বললাম— লজ্জা ঢাকার।

লজ্জা নাকি মানুষের চোখে বা মুখে থাকে। আর আমার নাকি নাকে লজ্জা। আমি সব সময় নাক ঢেকে রাখি, সে সেটা বলছিল। আমাদের প্রথম ডেটিং হলেও সেখানে এরকম অনেক রোমান্টিক কথাবার্তা হয়েছিল। সে আসলে অনেক রোমান্টিক মানুষ। মাঝে মাঝে আমি অবাক হই— আর্মির লোক এত রোমান্টিক হয় কীভাবে? আমি যতটুকু জানতাম আর্মিরা রোমান্টিক হয় না, তারা অনেক রাগী হয়। মাঝে মাঝে ওকে দেখে আসলে মেলাতে পারি না।

আমরা কিন্তু পাঁচটায় বেরিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিল! সাড়ে আটটার মধ্যেই আমাদের বাসায় আসতে হতো।

নিয়ম ছিল এরপর বাইরে থাকা যাবে না। কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেছে তখনো আসতে ইচ্ছা করছিল না। কেমন যেন একটা ভালো লাগা কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন আরও একটু থাকি, গল্প করি। সময়মতো না ফিরলে লোকাল গার্জিয়ান আবার খোঁজ করে। কে কে আছে, কে কে নেই। একদিকে বাসায় ফেরার তাড়া আর অন্যদিকে আরও কিছুক্ষণ কথা শোনার আকাঙ্ক্ষা।

তখনো আসলে ভালোবাসা যে কী, সেটা পুরোপুরি ফিল করিনি। শুধু এতটুকু বুঝতে পারছিলাম একটা ভালো লাগা কাজ করছিল। অবশেষে বাড়িতে ফেরত গেলাম। গেটের সামনে বাইক থেকে আমাকে নামিয়ে দিল। ওদিকে আমার ফ্রেন্ডরা অপেক্ষা করছিল তাড়াতাড়ি যেন ব্যাক করি। আমাদের বাসার দুয়েকজন নিচে ছিল। আমার এক ফ্রেন্ড ছিল শিমু। তার ছোট বোন ছিল তানি। সেও আমাদের সাথে থাকত। তানি আবার ছিল টমবয় টাইপের, সব সময় সে ছেলেদের মতো পোশাক পরত, বাইক চালাতে পারত ইত্যাদি। তানির সে বাইক অনেক পছন্দ হলো, ভদ্রলোক যখন আমাকে নামিয়ে দিল, তখন ভদ্রলোককে বলল, 'ভাইয়া, আমিও বাইক চালাতে পারি।' তখন ওপাশ থেকে জবাব ছিল— 'আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন চালাবা, ওকে।' এসব কথাটথা হলো, আমার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ও চলে গেল। তাকে বিদায় দিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু সাথে সাথেই আবার পেছনে ফিরে দেখতে শুরু করলাম। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। যখন দেখার বাইরে চলে গেল, তখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। সেদিন আর ফোনে কথা হয়নি।

প্রথম সাক্ষাতের পরের দিন আবার দুপুরে কথা বললাম। দুপুরবেলা লাঞ্চটাইমে অফিস থেকে ফিরত। আমরা সাধারণত সাড়ে তিনটার থেকে কথা বলতাম। সাড়ে চারটা বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আমাদের কথা চলত। আমাদের প্রথম ডেটিংয়ের পরদিনও ফোন দিচ্ছিলাম না। আসলে আমার প্রথম ডেটের রেশ তখনো কাটেনি। ওই দিন সে-ই প্রথম আমাকে ফোন করেছিল। কিন্তু আমাদের নির্ধারিত সময়ে নয়। প্রায় পাঁচটার দিকেই তার ফোন পেলাম। আবার আগের মতো ল্যান্ডফোনে কথা শুরু হয়। অক্টোবরের ২৮ তারিখে আমরা প্রথম দেখা করেছিলাম। আর দ্বিতীয়বার দেখা করেছিলাম নভেম্বরের ৫ তারিখে। দ্বিতীয়বার দেখা করতে আমরা আর একটু দূরে গেলাম— ক্যান্টনমেন্টের বাইরে, দ্বিতীয়বার আমরা এয়ারপোর্টের পাশে 'ওয়াটার ফ্রন্ট', ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেক কাপল দেখতাম। আমরা দেখা করতে

গিয়ে বসে থাকতাম। মানে কথা বলতাম না। বেশির ভাগ সময় চুপচাপ থাকতাম। ও টুকটাক প্রশ্ন করত, আমি উত্তর দিতাম। আমার যেতে ইচ্ছা করত এবং আমি অনেক প্রিপারেশন নিয়েই যেতাম।

প্রতিটা ডেটই আমার মনে আছে। প্রতিটা ডেটে আমি একটা করে নতুন ড্রেস বানাতাম। প্রতিবার সে একদিন আগে বলত— 'আগামীকাল ফ্রি, সময় দিতে পারবা কি না?' তো, সাথে সাথেই আমি গিয়ে একটা ড্রেস কিনে ফেলতাম। আমার মধ্যে কাজ করত কি, আমার যত ড্রেস আছে সব তো পুরোনো! আমার তো নতুন ড্রেস পরে যেতে হবে। কিন্তু সে কখনো বলেনি আমাকে সুন্দর লাগছে, এ ধরনের কোনো কথাই হতো না আমাদের মধ্যে। দেখা করতে যাচ্ছি, দেখা হবে এটার মধ্যেই থাকতাম। বেশির ভাগই কোনো কথা বা কোনো প্ল্যান করে যাওয়া, এমন কিছুই হতো না। আমরা বেশির ভাগ সময় অন্যান্য কাপল দেখতাম এবং কী করছে না করছে— এগুলো দেখতাম। হাসার কিছু পেলে হাসতাম। কম কথা বলতাম, কিন্তু যাওয়ার যখন সময় হয়ে গেলে ও বলত— 'চলো যাই, সন্ধ্যার আগে তো তোমাকে নামিয়ে দিতে হবে।' কিন্তু তখন আমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করত না। মনে হতো আমরা তো কেবল একটু আগেই এসেছি। এত তাড়াতাড়ি সময় কেন শেষ হয়ে গেল? একে অন্যের সঙ্গটা আমরা খুব উপভোগ করতাম। যখন দেখা করতাম পাশাপাশি থাকতাম যদিও কথা বলা কম হতো। ওই যে পাশাপাশি ছিলাম এটাই ভালো লাগত। এরকম চার-পাঁচ বছর চলল। এর মধ্যে আমি অনার্সে ভর্তি হলাম। অনার্সে ভর্তি হওয়ার পরে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে কলেজের কাছাকাছি এরিয়াতে চলে এলাম। অনেক দূর হয়ে গেল। আমি থাকতাম হোম ইকোনমিকসে আর ও থাকত একটা ক্যান্টনমেন্টে। ফলে দেখা করাটা একটু কমে যাচ্ছিল। আগে দেখা করাটা দুই মাসে হয়তো দুই বার, মানে এক মাসে একবার কিংবা কখনো দুই মাস মিলিয়ে একবার দেখা হতো। ক্যান্টনমেন্ট থেকে যখন দূরে চলে গেলাম, তখন দেখাটা হতো না ওইভাবে। কারণ, ওর আফিস শেষে আমাকে পিক করতে আসা এবং আলটিমেটলি দেরি হয়ে যাওয়া, সন্ধ্যা হয়ে যাবে— এটার জন্য বাইরে যাওয়া হতো না। দেখা যেত যে দেখা কম হচ্ছে এবং এতে মন খারাপ হতো অনেক। আমরা ফোনে কথা বলতাম অবশ্য। প্রতিদিন ওই নির্দিষ্ট টাইমটায় আমরা ফোনে কথা বলতাম। একটা সময় নিজেকেই প্রশ্ন করতাম, আচ্ছা কেন করি দেখা? সেও বা কেন দেখা করে?

আমি কেন করি সেটা একটু জানি, তা হলো তাকে আমার ভালো লেগেছে। আমাকেও তার ভালো লেগেছে। তাহলে আর একটা স্টেপ এগোচ্ছি না কেন? ও কেন নিচ্ছে না স্টেপ? আমি কেন নেব? এরকম প্রশ্ন আসত মাথার মধ্যে। এভাবেই যাচ্ছিল আরও একটা-দুইটা বছর। মাঝখানে একটা 'ইউ এন মিশন'-